**Pratidhwani the Echo**
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
**ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)**
**Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-II, January 2024, Page No.32-43
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

# রবীন্দ্রনাথের সমবায় চিন্তা

**ড. কমল আচার্য**

*বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাবিদ্যালয়, সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা*

***Abstuct:***

*Rabindranath Tagore, the poet of the world, is the Gurudev-poet guru after all, he is an Indian. In the bosom of the motherland in which the poet was born, nourished by the unkind love and beauty of the motherland and united in the acquaintance of the priest of the world humanity, that motherland and the motherland were at the meeting place of the world community, then it was in the mourning of subjugation. And his children were youths in the darkness of illiteracy, deen powerless in ignorance divided by religious morals and superstitions, poor, mindless, hopeless subordinates under the economic exploitation of the capitalist state ruler. Therefore, not only in the creativity of the poet's imagination, but also in his personal efforts, he devoted himself to the overall development of this unfortunate nation of the motherland and motherland. He knows that the whole of India, including Bangladesh, is basically an agricultural country. So, first of all, rural areas need to be improved. There is an urgent need to bring cultural co-operation between rural farmers and common people. Then they need to be educated in agriculture. Only then can they be stimulated to work cooperatively with the power of unity awakened in ideological cooperation. And with the collective efforts of these working cooperatives, they can be taken to the fertile field of agricultural cooperatives by focusing on livelihood cooperatives. We get Gurudev's in-depth plan of financial cooperatives and industrial cooperatives from the hands of the planned idea of this agricultural cooperative. This is not only the plan of the thinker, but by making it a reality with his own efforts, the poet employed all his energies to keep the bond of agricultural, financial and industrial co-operatives of the subjugated nation intact. His real reflection is the establishment of Kabir Sriniketan along with Santiniketan. And with these two institutions we get Gurudev's far-planned co-operative policy of co-operative knowledge, science and religion. Above all, it is through this link of knowledge, science and religious cooperation that we get the honey mixture of sage Rabindranath Tagore's world cooperative policy.*

*Yastu sarvani bhutani atmanyeva anupashyati*
*Sarva bhooteshu cha atmanam na vijugupsate*

*That is, he who sees all the demons in the Supreme Soul and sees the Supreme Soul in the Supreme Soul, then he hates no one else. "All-pervasive Lord Tasmat Sarvagat: Shiva". Then in all beings he sees the Jiva in the knowledge of Shiva, sees Shiva in the Jiva knowledge. And*

*see Sarvagatamangal. It is through the pursuit of this consciousness that the Indian people are not jealous, not jealous, not dominant, not powerful, then caste with caste, religion with religion, society with society, home country with foreign country, with you, forget the other divisions, people are inspired to an integral world sense and among all the people of the world. By uniting themselves, they meet in a united union. It is here that the universal expression of Rabindranath, the priest of idle action, the colonial philosopher poet, the universal poet Rabindranath, is articulated.*

**KeyWords: Sanskti, Chakbandikaran, Collective Form, Sriiketana, SadVidya, Samanjasya.**

'সমবায়' শব্দের অর্থ নিবিড় সংযোগ, মেলক সংসক্তি। এই নিবিড় মেলক সংযোগ-সংসক্তিতে আমি রূপ ইগো নয়, "আমরা" রূপ বহুর মিলিত শক্তির কথাই মনে আসে। আর এই বহু মানুষের মিলিত শক্তির নামই গুরুদেব কথিত সভ্যতা। এমনই এক সভ্যতার নাম ভারতীয় সভ্যতা। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ভারতীয় সভ্যতায় বাস করে ঋষির প্রজ্ঞায় সভ্যতার এরূপ ঐকত্রিক মিলনের শক্তিতে এক কল্যাণমুখী বিশ্বসমবায় সৃষ্টির সাধনাই করে গেছেন তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতে, মননে ও ধ্যানে। যে মাতৃভূমির কোলে কবি জন্মগ্রহন করেছেন, যে দেশমাতৃকার অকৃপণ স্নেহ- লালিত্যে পুষ্ট হয়ে বিশ্বমানবতার পুরোহিতের পরিচিতিতে মিলিত হয়েছিলেন বিশ্বমহাসমবায়ের মিলনাঙ্গনে, সেই জন্মভূমি ও দেশমাতৃকাই তো ছিল তখন পরাধীনতার গ্লানিতে ক্লিষ্ট। আর তাঁর সন্তানরা ছিল অশিক্ষার অন্ধকারে ন্যুব্জ, ধর্মীয় লোকাচার ও কুসংস্কারে শতধা-বিভক্ত, জ্ঞানহীনতায় শক্তিহীন দীন, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় শাসকের অর্থনৈতিক শোষণে হত-দরিদ্র, চেতনাহীন, ভরসাহীন-পরাধীন। তাই শুধু ভাবলোকে সৃষ্টির সৃজণশীলতাতেই নয়, ব্যক্তিগত কর্মোদ্যোগেই তিনি জন্মভূমি তথা দেশমাতৃকার এই হতভাগ্য জাতির সার্বিক উন্নতিতে নিষ্কাম কর্মব্রতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি জানেন, বঙ্গদেশ সহ সমগ্র ভারতবর্ষ মূলত কৃষিপ্রদান দেশ। সুতরাং সর্বপ্রথম পল্লীর উন্নতি সাধন দরকার। পল্লীর কৃষক তথা আপামর সাধারণের মধ্যে সাংস্কৃতিক সমবায়-যোগে তাদের মধ্যে ভাবসমবায় আনা আশু প্রয়োজন। তারপর তাদের কৃষিশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা দরকার। তবেই ভাবসমবায়ে জাগ্রত ঐক্য সমবায়ের শক্তিতে তাদের কর্মসমবায়ে উদ্দীপ্ত করা যাবে। আর এই কর্মসমবায়ের ভরসাপূর্ণ ঐকত্রিক প্রয়াসেই জীবিকা সমবায়ের অভিমুখীন করে তাদের নিয়ে যাওয়া যাবে কৃষিসমবায়েরও উর্বর ক্ষেত্রে। এখানে মনে রাখার দরকার যে, গুরুদেব তাঁর সমবায় চিন্তার এই স্বপ্ন পূরণে তাঁর পরিকল্পনার কথা তৎকালীন রাষ্ট্রীয় নেতা ও ইংরেজ সরকারকে জানিয়েও তিনি তেমন ইতিবাচক সাড়া পাননি। এতে আশাহত, অভিমানাহত কবি নিজের ক্ষুদ্র শক্তিতে স্বীয় জমিদারিতেই পল্লী উন্নয়নে তাঁর সুচিন্তিত ও সুদূরপ্রসারী সমবায়নীতি ব্যবহারিকক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

**কৃষি সমবায়:** কৃষি সমবায় বিষয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তা সুগভীর মানবতায় ঋদ্ধ, জাতির জীবন-জীবিকার সমস্যা ও সমাধান উদ্ঘাটনে দূরদর্শী অর্থনীতিবিদের মতো সূক্ষ্ম তাঁর চেতনায় সেই চিন্তা ছিল প্রতিষ্ঠিত এবং সেই চিন্তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। প্রথমেই কবি ভূমি সমস্যা, কৃষি-প্রকরণ সমস্যা ও কৃষক সমাজের সমস্যা- এই ত্রিবিধ সমস্যার চিন্তা করেন। মধ্যস্বত্বের বিলোপ সাধন করে প্রজাস্বত্বের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তিনি প্রথমে সচেষ্ট হন। তারপর চেষ্টা করেন জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দিয়ে জোতজমির চকবন্দীকরণ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা যাতে চাষীরা কাগজে কলমে ভূমি-মালিকানা লাভ করতে পারে। কৃষিপ্রকরণ সমস্যা বিষয়ে কবির মন্তব্য- "মান্ধাতার আমলের হালবলদ নিয়ে আলবাঁধা টুকরো জমিতে ফসল

ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা।" স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, কবি সাধারণ হাল-লাঙলের অতিরিক্ত উন্নত ফলের লাঙল ব্যবহারে ফলন বৃদ্ধির কথা বলেছেন৷ তাছাড়া কবি ঝাড়াই- মাড়াই কল ও ফসল সংরক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বনে চাষীদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছেন। কবি দেখেছেন- চাষীদের পরস্পরের মধ্যে ভাবের অনৈক্য, সাংস্কৃতিক শক্তিহীনতা। কৃষক সমাজের এই সমস্যা সমাধানে কবি প্রথমে তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসাধনে ভাবৈক্য আনয়নে সচেষ্ট হন। তার সূত্র ধরেই তাদের মধ্যে সুষ্ঠু জমি বন্টনের ইতিবাচক পথ নির্দেশনায় আনন্দের ভরসা সঞ্চার করেন। তারপর তাদের ঐকত্রিক কৃষিকার্যের প্রতি অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে কৃষিসমবায়ে শক্তি সঞ্চার করতে চেয়েছেন। এইভাবে কৃষি সমবায়কেই মূল হাতিয়ার করে রবীন্দ্রনাথ পল্লী উন্নয়নের কথা ভেবেছেন। কেননা, তিনি এই সত্যে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন যে, কৃষিসমবায়ী চিন্তাই হবে সর্বক্ষেত্রে সমাজের মূল চালিকাশক্তি। যে কবি আছেন মাটির কাছাকাছি, সেই কবির বাণীর জন্য কবি শুধু কান পেতেই ক্ষান্ত হননি, 'দুইবিঘা জমি'র উপেনের মনের মতো দুর্গম স্থানে তিনি স্বয়ং অবগাহনও করেছেন। তাই এইসকল শোষিত, বঞ্চিত গ্রামীন মানুষের মনে ভরসার সঞ্চার করে তাদের আত্মশক্তিতে দৃঢ় করতে চেয়েছেন সমবায়ী চিন্তায় সামিল করে। পল্লী উন্নয়নে কবির মানবিক তাড়না যে কত ঐকান্তিক ছিল, তার প্রমাণ আমরা পাই ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রাশিয়া ভ্রমনে। 'রাশিয়ার চিঠি' থেকে আমরা জানি যে, তাঁর রাশিয়া ভ্রমনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল কৃষিসমবায় সম্পর্কিত তাঁর নিজস্ব চিন্তার সঙ্গে রাশিয়ার 'কালেক্টিভ ফার্ম' বা ঐকত্রিক কৃষিব্যবস্থার তুলনা করা এবং রাশিয়ার উন্নত কৃষিব্যবস্থার পন্থাগুলোকে এবং কৃষিশিক্ষা বিষয়ক প্রণালীগুলোকে আত্তীকরণ করে এনে দেশীয় কৃষি ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করা। রাশিয়ায় তিনি দেখেছেন যান্ত্রিক কৃষির প্রসারে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ঐকত্রিক কৃষিব্যবস্থায় আধুনিক প্রণালীর প্রয়োগ। রাশিয়ার এই সমবায় কৃষি ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথকে আরো সমৃদ্ধ করে। কবি বলেন যে, অনেকের ভাবনার যোগ ঘটে সভ্য মানুষের ভাবনা বড়ো হয়। তেমনি অনেক কৃষকের কৃষি কাজের সম্মিলনে কৃষিব্যবস্থাও আরো বড়ো হয়ে উঠবে।

যারা কৃষক, যারা কৃষিকান্ডের পুরোহিত, যাদের হাতে কৃষি-বিপ্লবের মূল জিওন কাঠি, কবি তাদের হাতে জমির মালিকানা তুলে দেবার পক্ষপাতি। তারপর উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও কৃষি-চিকিৎসা ব্যবস্থায় কৃষিতে দৈবনির্ভরতা দূর করে উৎপাদনের নিশ্চয়তা আনার ওপর কবি জোর দিয়েছেন। তারপর চেয়েছিলেন কৃষকদের আনন্দঘন ঐকত্রিক ভাবসম্মিলনে সামিল করে, ঐকত্রিক কৃষিব্যবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাদের জীবিকা সুনিশ্চিত করতে। কবির বিশ্বাস, এইভাবে ঐ ঐকত্রিক কৃষিব্যবস্থায় যে সম্মিলিত কর্মের উদ্যোগ জাগবে, তাতে যৌথ মনন ও চিন্তনের পথও হবে প্রশস্ত। আর এই মিলনমুখী কৃষি সমবায়েই জীবিকার পথ প্রশস্ত হবে, ব্যবসা সমবায়ের পথও যাবে খুলে। দারিদ্র্য ঘুচবে, ব্যবসায়ী ব্যবসায়ীতে, ক্রেতা-বিক্রেতাতে অশুভ প্রতিদ্বন্দ্বীতা দূর হবে, ঘুচবে মনের দৈন্য- দারিদ্র্যও।

**অর্থ সমবায়:** কৃষিই ভারতের অর্থনীতির মূল বুনিয়াদ। কিন্তু শুধু কৃষি সমবায়েই নয়, যে কোনো জীবিকা সমবায়েরই মূলে দরকার অর্থ বা মূলধন। কবির মতে গরিবের মূলধন অর্থ নয়। তাদের সম্মিলিত শক্তিই তাদের মূলধন। অনেক গরীব আপন সামর্থ্য এক জায়গায় যদি মেলাতে পারে, তখন ঐ সম্মিলিত সামর্থ্যই হবে মূলধন। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে কবি বলেন- ''যখন আপন শক্তির মূলধন হইয়া জনসাধারণের কারবার না চলে, তখন সকল ব্যাপারেই মানুষ দৈবের কাছে, গ্রহের কাছে, পরের কাছে হাত পাতিয়া ভয়ে ভয়ে কাটায়।'' এই দৈন্যদশা কাটাতে গেলে চাই ঐকত্রিক কর্মপ্রচেষ্টায় জীবিকা সমবায় তৈরী করা। প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের অন্তর ও বাহ্যশক্তির ঐক্যে যখন বিরাট শক্তি- সম্পন্ন হয়, আর এই ঐকত্রিক শক্তিতে যখন

অর্থনৈতিক শক্তিতেও হয় শক্তিমান, তখনই তা হয় সমবায় প্রণালীতে ধন উপার্জন। কবির সুচিন্তিত অর্থদর্শন বলে- "যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডিমক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেননা, সকল রকম প্রতাপের বাহকই হচ্ছে অর্থ। সেই অর্থ অর্জনে যেখানে ভেদ আছে সেখানে রাজপ্রতাপ সকল প্রজার মধ্যে সমানভাবে প্রবাহিত হতেই পারে না।" (সমবায়নীতি)

এখানে অর্থসমবায়ে ইংরেজের অর্থনৈতিক বৈষম্যের অমানবিক ভেদবুদ্ধির প্রতিই কবি ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'হোমরুল আন্দোলন', 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড', 'অসহযোগ আন্দোলন' প্রভৃতি কারণে কবি রাষ্ট্রীয় শক্তির ওপরে বিশ্বাস হারিয়েছেন। এছাড়া ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইন্ডাসট্রিয়্যাল কমিশনের রিপোর্টে মদনমোহন মালব্য প্রদত্ত আর্থিক উন্নতির ধারা সম্পর্কে মন্তব্য, ১৯১৪ সালের ম্যাকনাগান কমিটির সমবায় আন্দোলনের সুবিধা-অসুবিধা, ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে আলোচনা কবিকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কবির স্বপ্ন ছিল- "যদি অনেক চাষী মিলিয়া এক গোলায় ধান তুলিতে পারিত ও এক জায়গা হইতে বেচিবার ব্যবস্থা করিত তাহা হইলে অনেক বাজে খরচ ও বাজে পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইত।" (সমবায়নীতি-১) ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিকেতন' প্রতিষ্ঠাকালের কিছু পরে কবি পল্লী উন্নয়নে কৃষি সমবায় সম্পর্কে এই যে সমাজতান্ত্রিক জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন উদ্দীষ্ট রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ ও বিভিন্ন কমিশনের আলোচনা- সমালোচনার প্রেক্ষিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের রাশিয়া ভ্রমনের পর, রাশিয়ার কালেক্টিভ ফার্মের কৃষিব্যবস্থা দেখে তার শ্রীনিকেতনের আদর্শবাহী ভাবনাগুলো ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে আরো উন্নত বিজ্ঞানভিত্তিক হয়ে উঠেছিল। যেমন-

ক) কবি স্পষ্টই বলেছেন যে, পুঁজিবাদী ইংরেজ সরকারের অর্থনৈতিক বৈষম্য নিষ্পেষিত পল্লীবাসীর মধ্যে সমবায় প্রণালীর সুফল পৌঁছে দিতে গেলে আর্থিক অসাম্য দূর করে আনতে হবে অর্থ-সমবায়। এই অর্থ সমবায় সংগঠনেই হবে ধন উপার্জন।

খ) কবি মনে করেন,- কৃত্রিম উপায়ে ধনবণ্টন করে কোনো উন্নতি হয় না। সত্য উপায়ে ধন উৎপাদন করা চাই। জনসাধারণ যদি তাদের উৎপাদন ক্ষমতাকে একত্রে মেলাবার উদ্যোগ করে, তবেই কেবলমাত্র আর্থিক সাম্য ও স্বাধীনতা আসবে।

গ) রাশিয়া থেকে ফিরে এসে (১৯৩০) কবি ভারতে তখনকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সমবায়গুলোর উৎপাদনে আগ্রহী ও ঋণদানেই বেশী মনোযোগী হবার প্রবনতা দেখে আশাহত হয়েছেন এবং রাশিয়ার কালেক্টিভ ফার্ম' বা ঐকত্রিক কৃষিব্যবস্থা ভারতে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে প্রধান দুটো বাধার সম্মুখীন হয়েছেন-

i) চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই, সেই স্বত্ব পরমুহূর্তেই মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে, আর তাতে চাষীর দুঃখ বাড়বে বই কমবে না।

ii) চাষীর নিজের সম্পত্তি যৌথ সম্পত্তিতে মিলিয়ে দিতে সব চাষী রাজী নাও হতে পারে।

এমন পরিস্থিতিতে কবি নিজেই একটি মাঝামাঝি সমাধান সূত্র আবিষ্কার করে বলেছেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে, অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের মধ্যে ছাপিয়ে যাওয়া চাই। তাহলে সম্পত্তির সমত্ব লুব্ধতায়, প্রতারণার বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌঁছাবে না। বোঝা যাচ্ছে, ব্যক্তিভোগের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত ধন সাম্যের ভিত্তিতে গণবন্টনে কবি বিশ্বাসী। এইভাবে কর্মসমবায়ের অন্তর্গত জীবিকা সমবায়ে কবি কৃষিসমবায়ও গঠন করতে চেয়েছেন এবং ধনবন্টনে গণতান্ত্রিক অর্থসমবায়ে জাতির কল্যাণসাধন করতে চেয়েছেন। 'কো-অপারেটিভ' বা সমবায়

প্রণালীতে একজোট হয়ে জীবিকা সংস্থানের এই যে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক প্রণালীর পথ কবি দেখালেন, তাতে বিশ্বের মানবসমাজের সঙ্গেও ঘটবে জাতির আপন প্রাণের সম্বন্ধ। কবির স্বপ্ন এতে শুধু ধন বা অর্থে নয়, মনের প্রসারে ও লোকশিক্ষার ধনেও জাতি ধনী হয়ে উঠবে, বড়ো হয়ে উঠবে।

**শিল্প সমবায়:** পল্লী উন্নয়নের যে কয়টি লক্ষ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শ্রীনিকেতন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন,- তার মধ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি ও সৃজণশীলতা শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্য অন্যতম। তার ওপর চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পে সৌন্দর্য সৃষ্টির নান্দনিক প্রকাশরূপকে তো তিনি সর্বকালের আত্মিক সৌন্দর্যে বিশ্বজনীন করে তুলেছেন।

একদিন বাঙালী যন্ত্রের ব্যবহারে জীবিকায় শ্রীবৃদ্ধি করেছিল। মাড়াইকল চালিয়ে সে দেশদেশান্তরে চিনি যুগিয়েছিল। ঘানির পেষাই কল চালিয়ে খাটি সরষের তেলে সে দেশকে সমৃদ্ধ করেছিল। নিজ হস্তে তৈরী তাঁত যন্ত্রে বস্ত্র বুনে দেশ বিদেশের বস্ত্রের চাহিদা মিটিয়েছিলো। তখন লক্ষ্মীশ্রী ছিল গ্রামে গ্রামে, আনন্দ ছিল প্রতি ঘরে ঘরে। কিন্তু আমাদের পণ্য সামগ্রীর কারিগরী উৎকর্ষে আকৃষ্ট শক্তিমান ইংরেজ আমাদের সেই সনাতন কারিগরী শিল্প নিকেতনের মূলে হানলো চরম আঘাত। বিলেতি পণ্যের চাকচিক্য আমাদের মনোহর করলো। আমরাও মোহান্দে ডুবে ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলে দিলাম। স্বাধীন অর্থনৈতিক বনিয়াদকে ভুলে গিয়ে ফন্দিবাজ ইংরেজের বিজাতীয় ডিগ্রী লাভ করে পরাধীন কেরানীগিরিতে আত্মনিয়োগ করে নিজের দীনতাকে প্রকাশ করলাম। ডিগ্রী বা চাকরীর মোহ জাতির কর্মক্ষমতা ও শিল্প নৈপুণ্যকে বিনষ্ট করে। গুরুদেব তাঁর 'শ্রীনিকেতন' প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে ঐকত্রিক কর্মের আনন্দের ভেতর দিয়ে হাতে কলমে কাজ করার যে আদর্শ স্থাপন করেন এবং শুধু টাকার জন্য নয়, মনের দিক থেকেও বড়ো হবার আনন্দঘন যে উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা করেন, তাতে তাঁর গভীর উদ্দেশ্যই ছিলো- স্বদেশী কারিগরী শিল্পের হৃত গৌরব পুনরুজ্জীবিত করা। অবশ্য গুরুদেব এও বুঝিয়েছিলেন যে, বঙ্গবিচ্ছেদকালে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' বলে আমরা বিলেতিদ্রব্য বর্জনের যে ঢেউ তুলেছিলাম, সেই জাত্যাভিমানযুক্ত স্বদেশ প্রেম বেশীদিন টিকবে না। কবির মতে তার মূল কারণই হলো - সেই প্রচেষ্টা অন্তরের সত্যযোগে শক্তিমান ছিল না। এখানেও কবির দূরদর্শী মন্তব্য এই যে, আমাদের সকলের শক্তি নিয়েই রাজার শক্তি, ধনীর শক্তি। অথচ রাজা বা ধনী আমাদের সেই কর্মশক্তিকেই নিজের হাতে সংগ্রহ করে, সংহত করেই আর্থিক ধনে ধনী হয়ে ওঠে, আর আমাদেরও করে তোলে শক্তিহীন। কিন্তু আমরা যদি সেই শক্তিকেই প্রত্যেকে ব্যবহার করবার উপায় কর্মসমবায়ে করতে পারি, তাহলে আমাদের সেই কর্মের শক্তি সমবায়ই আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের রাজত্ব হয়ে উঠবে। এইভাবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমাদের সকলের কর্মশ্রমকে শিল্পকর্মে মিলিত করে শিল্পসমবায়ে এক অর্থশক্তি লাভ করা এবং সেই শক্তিকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া।

পক্ষান্তরে, আমাদের এও মনে রাখতে হবে যে, শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিমি দুনিয়ার ভাবনায় প্রভাবিত হওয়াকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেননি। তিনি বুঝেছিলেন যে, গোটা পৃথিবী জুড়ে যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে পরিচালিত হতে দিলে বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্পসমবায় গড়ে উঠবে। শিল্পায়ন দেশের উন্নতির কারণ হতে পারে, তবে তা হবে দেশীয় চাহিদা ও দেশীয় পরিচালনের ভিত্তিতে দেশীয় শিল্পসমবায়ে। অবশ্য কবি এও বুঝেছিলেন যে, ভারতবর্ষে যেখানে মূলধনের অভাব, সেখানে গান্ধীজীর চরকানীতি কিংবা কবির নিজস্ব পথে অর্থনীতির অভিমুখকে

পরিচালিত করা সম্পূর্ণ সম্ভব নয়। সুতরাং, শিল্পসমৃদ্ধ বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলির প্রভাব শিল্পক্ষেত্রে নিতে ভারত বাধ্য। এদিকে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতারও নিতান্ত অভাব। কারণ, ইংরেজদের মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিকভাবে ভারতবাসীকে পঙ্গু করে রেখে অবাধ শোষণের ক্ষেত্র তৈরী করা। এমন বিরুদ্ধ পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুললো দেশী ও বিদেশী শিল্পপতিদের ভারতে ভারী শিল্প গড়ে তোলার অনাগ্রহতা। এই বিষয়ে কবির মন্তব্য ছিল যে, দেশীয় শিল্পপতিদের দেশীয় পাবলিক সেক্টর থেকেই মূলধন সংগ্রহ করে সেই বিনিয়োগকারী সাধারণ দেশীয় মানুষদেরই ঐকত্রিক শ্রমসমবায়ের মূলধনে উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং লভ্যাংশের অর্থ সমবায়নীতিতে বন্টন করে দেশীয় শিল্পের তথা দেশের সাধারনের জীবিকায় লক্ষ্মীশ্রী আনয়ন করা।

সার্বিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা সভ্যতার প্রাণ। কবির মতে একদল লোক না খেয়ে উপোশ করে মরবে, দুর্গতিতে তলিয়ে যাবে, আর একদল লোক আরাম-আয়েশে থাকবে এটা কোন সভ্য সভ্যতার লক্ষন হতে পারে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের একাত্মতায় সার্বিক কল্যাণ সাধিত হলেই সভ্যতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা পায়। অনেকের ভাবনার যোগ ঘটে সভ্য মানুষের ভাবনা বড়ো হয়েছে। তেমনি অনেক কাজের সম্মিলনে কোন কাজ বড়ো হয়ে উঠতে পারে। এই যে যৌথ মনন ও চিন্তন, সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ, এই পথেই শুধু যে শিল্প সমবায়ই গড়ে উঠবে তা নয়, জীবিকা সমবায়ের সকল স্তরেই সকলের উপার্জনের পথ প্রশস্ত হবে।

**জ্ঞান সমবায়:** জ্ঞান হচ্ছে সবিদ্যা থেকে উৎসারিত সেই বোধশক্তি যার প্রভাবে মনুষ্যত্ববোধের উদ্বোধন ঘটে, চিত্ত কলুষমুক্ত হয়, মানুষ পায় প্রেমের শাশ্বত পথে এগিয়ে চলার দৃষ্টিশক্তি। আর জ্ঞানের এই আত্মচৈতন্যের উদ্বোধনে লাভ করে আত্মশক্তি এবং সর্বজীবে প্রেম বিতরণে এক কল্যাণাকাঙ্ক্ষার নিষ্কাম কর্মপথে ধাবিত হয়ে মানুষকে আত্মমুক্তি ঘটানোর শক্তিতে করে শক্তিমান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন,- "প্রথমে অজ্ঞান থেকে মুক্তির মধ্যে জ্ঞান নিজেকে লাভ করে- তারপরে নিজেকে দান করা তার কাজ। কর্মের দ্বারা সে নিজেকে দান করে, সৃষ্টি করে- অর্থাৎ অর্জন করে, অর্থাৎ যে শক্তিকে পরের ঘরে বন্দীর মতো থেকে কেবলই বদ্ধ করে রেখেছিল- সেই শক্তিকেই আত্মীয়- ঘরে নিয়তই ত্যাগ করে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।"

('শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত 'জগতে মুক্তি' প্রবন্ধ)

আসলে জ্ঞান বিশ্বজগতে অখন্ড নিয়মকে আবিষ্কার করে যখন দেখে যে কার্যকারণের কোথাও ছেদ নেই, তখনই সে মুক্তিলাভ করে। জ্ঞানের সার্থকতা কর্মে। জ্ঞানের সহযোগে নিষ্কাম কর্ম যখন বহু বিস্তৃত হয়, তখন তার জাগ্রত শক্তিতেই খুঁজে পাওয়া যায় প্রেমকে। আর এই প্রেমের জাগ্রত শক্তি বহুধা প্রসারিত হয়েই ত্বরান্বিত করে জীবনের সার্থকতার পথ, মুক্তির পথ।

বোঝা গেল যে, অন্তরের নিষ্কামকর্মের সত্যোপলব্ধিই জ্ঞান। "অসতোমা সদ্‌গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়"- অসৎ হতে সৎকর্মে ধাবিত করা, অন্ধকার থেকে জ্যোতির্ময়লোকের দিগনির্দেশ করা এবং মুক্তিতে অমৃতের সঙ্গে মিলিত হবার মতো সবিদ্যার উদ্বোধনই জ্ঞান। আর এই জ্ঞানের প্রভাবেই মানুষ নিষ্কাম কর্মের সত্যপথে ধাবিত হবে। আত্মশক্তি লাভ করে সেই নিষ্কাম কর্ম পথেই খুঁজে পাবে এই সত্যের সন্ধান যে, অন্যের সঙ্গে বিচ্ছেদেই তার বন্ধন, সহযোগেই মুক্তি। এখানেই ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানসমবায়ের মূল সত্য হয় উদ্ভাসিত।

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানবিক নিষ্কাম কর্মযোগের পথেই আবিষ্কার করেছেন যে, ভারতবাসীর দীন-হীন জীবন- চর্যার মূলেই রয়েছে জ্ঞানহীনতা। এই জ্ঞানহীনতা আসে বুদ্ধির ত্রুটিতে, প্রথার দোষে ভ্রান্ত ধর্মের বিভ্রান্ত পরিচালনে ও চরিত্রের দুর্বলতায়। অথচ সজ্ঞানীর নিষ্কাম কর্মের বৈভবে যখন বৃহৎ সংখ্যক মানুষ এক ভাব- ঐক্যের এক সম্মিলিত আত্মশক্তি লাভ করে- তখন আত্মশক্তির উদগাতা ঐ জ্ঞানসমবায়ই হয়ে যায় মুক্তির মূলধন। নিষ্কাম প্রেমের কর্মশ্রমে উদ্বোধিত এই মুক্তির মূলধন জ্ঞানসমৰায়েই ঘটবে জাতির মুক্তি। অর্থাৎ ভারতের মতো আধ্যাত্মিক জীবন রসে জারিত জ্ঞানসমবায় জাত ভাবসমবায়ের উর্ব্বর পলিতেই ফলবে ভারতবাসীর আত্মমুক্তির সোনার ফসল। আর এই সোনার ফসলের মূলধন নিয়েই ভারতবাসী জীবন-ধর্মের সত্যপথ বেয়ে সমৃদ্ধ হবে এবং এই ভাবসমৃদ্ধির, এই জ্ঞানসমৃদ্ধির ঐকত্রিক শক্তিবলেই ভারতবাসী জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে।

জ্ঞান সমবায়ে যে প্রচন্ড শক্তি সঞ্চিত হয়, তা সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হতে পারে, আবার ধ্বংসের কাজেও। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কবি জানাচ্ছেন যে, ইউরোপ জ্ঞান সমবায়ে যে প্রচন্ড শক্তিকে হস্তগত করেছে, আত্মবিনাশের জন্য সেই শক্তিকেই দুই-দুইটি মহাসমরে সে আবার ব্যবহার করেছে। কবি অত্যন্ত ব্যথাহত হৃদয়ে জানাচ্ছেন-

আজ যন্ত্রবিদ্যা মানুষের হাতে অস্ত্র দিয়েছে বহুশত শতঘ্নী, আর যুদ্ধের শেষে হত্যার হিসাব ছাড়িয়ে চলেছে প্রভূত শতসংখ্যা। আত্মশত্রু আত্মঘাতী মানুষ ধ্বংসবন্যার স্রোতে গা ভাসান দিয়েছে। মানুষের আরম্ভ আদিম বর্বরতায়, তারও প্রেরণা ছিল লোভ; মানুষের চরম অধ্যায় সর্বনেশে বর্বরতায়, সেখানেও লোভ মেলেছে আপন করাল কবল। জ্বলে উঠেছে প্রকান্ড একটা চিতা- সেখানে মানুষের সঙ্গে সহমরণে চলেছে তার ন্যায়নীতি, তার বিদ্যাসম্পদ, আর ললিতকলা।'

(পল্লীপ্রকৃতি' প্রবন্ধ গ্রন্থের হলকর্ষণ প্রবন্ধ'।)

জ্ঞানসমবায়ে অর্জিত শক্তির এই বর্বরোচিত ইউরোপীয় প্রকাশের পক্ষান্তরেই আমরা দেখি- যথার্থ জ্ঞানসমবায়জাত প্রেমের শক্তিতেই প্রভু যীশুখ্রীষ্ট সর্বমানবের কল্যাণমুখী ঐকত্রিক শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কবির বক্তব্য এই যে, জ্ঞানসমবায়ে মানুষ মানুষের মতো বাঁচার পথ খুঁজে পায়, কিন্তু বিষয়ের অন্বেষণে খুঁজে পায় মানুষ মারার পথ। জ্ঞানসমবায়ের পথ ধরেই যে প্রেম জাগে, সর্বজন কল্যাণমুখী সেই প্রেমের শক্তিতেই সত্যপথ উন্মুক্ত হয় এবং মানুষ পায় বাঁচার সত্য-পথের সঠিক দিশা। গৌতম বুদ্ধের করুণা-সাম্য-মৈত্রী ও প্রেমের পথে, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের জাতপাতহীন, বৈষম্যহীন সর্বগ্রাসী প্রেমের পথেই যে ভারতবাসীর মুক্তি ঘটবে সেই বিষয়ে কবির সঙ্গে আমরাও দঢ় সহমত পোষণ করতে বাধ্য।

**বিজ্ঞান সমবায়:** জ্ঞানসমবায়ের হাত ধরাধরি করে আসে বিজ্ঞান সমবায়। কারণ 'বিজ্ঞান শব্দের অর্থই হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান। জীব- জড় বস্তুজগতের বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানার্জনে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ অন্তে সম্যক সত্যের উদ্ঘাটনই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য মানবকল্যাণ। বিজ্ঞান মনের অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তা ঘোচায়, মনের সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব দূর করে। যে কোনো কুসংস্কারাচ্ছন্নতার আবরণের পর্দা সরিয়ে বিজ্ঞান অবারিত করে মনের উদারতা, সত্যের জ্যোতির্ময় পথ। আকণ্ঠ মানবকল্যাণের তাড়নে দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিজ্ঞান সমবায়ের ওপরেও বিশেষ জোর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। পল্লী উন্নয়নে জীবিকা সমবায়ে যে কৃষি সমবায়ের নীতি নিয়েছিলেন কবি, তাতে তিনি বিজ্ঞান সমবায়কে যুক্ত করে তার সাফল্য সুদৃঢ় করতে চেয়েছেন। উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিজ্ঞান ভিত্তিক ঐকত্রিক কৃষি ব্যবস্থা চালু করার সুদৃঢ় সাফল্য উদ্দেশ্যে তিনি

নিজ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা পাঠিয়েছিলেন কৃষি বিজ্ঞানী হবার জন্যে। তাঁরা ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষিবিজ্ঞানী হয়ে ফিরে এলে তিনি তাঁদের তাঁর নিজ জমিদারির কৃষিব্যবস্থার উন্নতিতে অধিতজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর ইচ্ছা ছিলো কৃষিকর্মে বহুর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে সাধারনের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে বিজ্ঞান সমবায়ে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে ঐকত্রিক শক্তিকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলা। কৃষিবিজ্ঞানীদের উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, কৃষি চিকিৎসা, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন উচ্চফলনশীল সার ও উন্নতমানের হলযন্ত্র আবিষ্কার করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে তার সুফল সমস্ত দেশে ছড়িয়ে দেওয়াই কবির মানস বাসনা। রবীন্দ্রনাথের ঋষিতুল্য জ্ঞানপ্রজ্ঞার সঙ্গে তাঁর মানবকল্যাণমুখী যে বিজ্ঞানসাধনা যুক্ত হয়েছিল, তাতে তাঁর সেই মানবকল্যাণ হয়ে উঠেছে বিশ্বমানবতার অভিমুখী। কবি বলেন,

বিজ্ঞানের সাধনা যেমন আমাদের প্রাকৃতিক জ্ঞানের বন্ধন মোচন ছিন্ন করছে, তেমনি মঙ্গলের সাধনাই আমাদের প্রেমের, আমাদের আনন্দের বন্ধন মোচন করে দেয়। এই মঙ্গলসাধনাই আমাদের সংকীর্ণ প্রেমকে প্রশস্ত, খামখেয়ালি প্রেমকে জ্ঞান সম্মত করে তোলে।

"বিজ্ঞানে প্রকৃতির মধ্যে আমাদের জ্ঞান যোগযুক্ত হয়। সে বিচ্ছিন্ন জ্ঞান নয়, সে অতীতে বর্তমানে ভবিষ্যতে, দূরে ও নিকটে সর্বত্র যোগযুক্ত হয়।"

('শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধ গ্রন্থের 'মুক্তির পথ' প্রবন্ধ)

বোঝা যাচ্ছে, যা নির্মল, যা অন্তরের স্বরাজ লাভের সামগ্রী, সেই শাশ্বত সত্যকে রুদ্ধদ্বার মন্দিরে আবদ্ধ করে রাখার নয়, সেই সত্য সম্পদকে নির্বিচারে সর্বমানবের কাছে পৌঁছে দেওয়াই তো বিজ্ঞানের সাধনা। আমাদের অন্তরে, আচরণে রিপু ও পাপের সংগ্রাম আছে। সেই সংগ্রামকে জয় করে পুণ্যের তপস্যায় দীক্ষা দেওয়াতেই সত্যব্রত রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানসাধনার মূল উদ্দেশ্য। আর এখানেই আমরা পেয়ে যাই বিজ্ঞান সমবায়ের মাধ্যমে মানব-কল্যাণে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বগত কল্যাণের মহতি অভিপ্রায়।

কবিগুরু বলেন, "অবিদ্যাই বন্ধন, সত্যকে পাওয়াতেই মুক্তি। সেই বৈজ্ঞানিক সত্য মানুষের মনকে বিচ্ছিন্নতা হইতে বিশ্বব্যাপিকতায় লইয়া যাইতেছে এবং সেই পথে মানুষের বিশেষ শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহিত যোগযুক্ত করিতেছে।" ('কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধ) কবির মানবিক দৃষ্টি জানাচ্ছে যে, কোনো জাতি কোনো বড়ো সম্পদ যদি পেয়েছে, তবে সেই সম্পদকে তো দেশে দেশে দিকে দিকে দান করার জন্যই পেয়েছে। প্রসঙ্গত তিনি জানান যে, ইউরোপের এরূপ বড়ো সম্পদ তার বিজ্ঞান, জনসাধারনের ঐক্যবোধ ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ। কিন্তু কবির দুঃখ যে, এই সম্পদ, এই শক্তি তো ঐক্যহীন, বিজ্ঞানহীন ভারতবাসীকে সত্য পথের বৈজ্ঞানিক চেতনা দেবার উদারতা তো ইংরেজ দেখায়নি। বিধিদত্ত সেই রাজ পরোয়ানা ইংরেজ না মানলেও কবির স্থির বিশ্বাস যে, অচিরেই ভারতবাসী ইংরেজের অজান্তে সেই ধন নিজেরা ধীরে ধীরে আত্তীকরণ করবে। তারপর আত্মকর্তৃত্বের শক্তি অর্জন করে নতুন নতুন শক্তি আবিষ্কারে ভারতবাসী নিজেকে উজাড় করে দিয়ে বিজ্ঞানের সর্বব্যাপী কল্যাণের আদর্শকে প্রতিস্থাপিত করবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জ্ঞানপ্রজ্ঞায় দেখেছেন যে, ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনায় অবিদ্যাই বন্ধন, মুক্তি জ্ঞানে। সত্যকে পাওয়াতেই মুক্তি। কিন্তু নিজেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করে জানাই তো অসত্য। অথচ সর্বভূতের সঙ্গে আত্মার মিল জেনে পরমাত্মার সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগটিকে জানাই তো সত্য জানা। আসলে, কবি বিজ্ঞান সমবায়ে শাশ্বত সত্যের সামঞ্জস্যটির সন্ধানই করতে চাইছেন। কবির মতে- প্রকাশলোকের অন্তরেই

অবস্থান করছে অপ্রকাশলোক। মানুষ অপ্রকাশলোকের সেই গহনে প্রবেশ করেই বিশ্বব্যাপারের মূল রহস্যগুলোর সন্ধান করে। যে সাধনায় সে এই রহস্যের সন্ধান করে তাই তো তার বিশেষ জ্ঞান- বিজ্ঞান। অন্তরের গুহাতিত শক্তিকে আবিষ্কার ও ব্যবহার করে সমৃদ্ধ হওয়ার যে সাধনা, সেই বিজ্ঞানসাধনাই মানুষের যথার্থ ধর্মসাধনা বলে কবি মনে করেন। তাইতো কবির সিদ্ধান্ত-

"মানুষের সাধনাও এক স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরের সাধনা। ব্যক্তিগত সংস্কার ছাড়িয়ে যাবে তার জিজ্ঞাসা, তবেই বিশ্বগত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে তার বিজ্ঞান। ব্যক্তিগত স্বার্থও জড়প্রথাগত অভ্যাস কাটিয়ে যাবে তার প্রয়াস, তবেই বিশ্বগত কর্মের দ্বারা সে হবে বিশ্বকর্মা।"

('মানুষের ধর্ম'-প্রবন্ধের প্রারম্ভিক ভূমিকায় কবির বক্তব্য অংশ)

এখানেই কবির বিজ্ঞানসমবায়ে বিশ্বগত চিন্তার প্রকাশরূপ দেখে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই।

**ধর্ম সমবায়:** ধর্ম' শব্দের বাচ্যার্থ ধরে রাখা, ধারণ করে রাখা বা বেঁধে রাখা। অর্থাৎ মানুষের চেষ্টা ও আচরণ যে সীমাবদ্ধ জীবনচর্যায় বেঁধে রাখে তাই ধর্ম। সমাজবদ্ধ মানুষের এই সীমার মাঝে এই বন্ধনকে লাভ করাই চরম সাধনা।

ধর্ম ভারতবাসীর ধর্মসমবায়ের মহান ঐক্য গড়ে দিতে পারেনি। আচারসর্বস্ব ধর্ম ভারতবাসীকে লোকাচারে ভেদবুদ্ধি দিয়েছে। এখানে শাক্ত- বৈষ্ণব- শৈব - গানপত্যে তাই এত বিরোধ। মৎসাহারী বাঙালীকে নিরামিষ ভোজী প্রতিবেশী তাই ঘৃণার চোখে দেখে। ভারতবাসীর মজ্জায় মজ্জায় দূরতিক্রম্য সংস্কার ও আচারের বেড়ি বিভেদকেই জন্ম দিয়েছে। তাই ভারতের জাতীয় সংহতিও শতধা বিভক্ত। আসলে যে মমত্ববোধে মানুষ মানুষের কাছে আসে, সেই মমত্ববোধকেই ধর্মের আচার-সংস্কারের চিত্তবৃত্তিতে মানুষ নিজের হাতেই গলা টিপে মারে। ভারতবাসীর এই চিত্তবৃত্তির বাহ্য আচারকে অত্যন্ত বড় মূল্য দিয়ে তার মমত্ববোধকে সংকীর্ন করে রেখেছে। তাই রাষ্ট্রসম্মিলনীতেও ভারতবাসী ধর্ম বিভেদের প্রাচীর তুলে শুধু দেশের মানুষ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি, বিশ্ব থেকেও সে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। আসলে ভারত জাতকে প্রাধান্য দিয়েছে, জাতিকে নয়। অথচ ইংরেজ নিজেকে খ্রীষ্টান জাত নয়, ইংরেজ জাতি হিসেবে পরিচয় দিয়েই জগতে শক্তিমান হয়েছে। কবি বলেন- "যা আমাদের ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে নিয়ে যায়, তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।"

(মানুষের ধর্ম'- প্রবন্ধে কবির ভূমিকা অংশ)

বোঝা গেলো- ধর্ম হলো মানুষের মনুষ্যত্বকে জীবনচর্যার সত্য সীমার মধ্যে প্রকাশ করার শক্তি। বিশ্বকবির মতে বিধাতার আনন্দ বিধানের সত্য-সীমা সমস্ত সৃষ্টিকে বেঁধে রেখেছে। এই সীমার বাঁধনেই কর্মীর আনন্দ, কবির আনন্দ, শিল্পীর আনন্দ- জীবনেরও আনন্দ প্রকাশ হয়ে উঠছে। ধর্মের সীমাটি যতই সহজ হয়, যতই সুব্যক্ত হয়, ততই তা সুন্দর হয়ে ওঠে। মানুষ তখন ততই শক্তি, স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্য লাভ করে বহুর মিলিত ঐক্যে শক্তিমান হবার আনন্দ লাভ করে। কবি বলেন,

ধর্মের সাহায্যে মানুষ আপনার সীমা খুঁজিতেছে, অথচ ধর্মের সাহায্যেই মানুষ আপনার অসীমকে খুঁজিতেছে। যাহা ছোটো করে তাহাই বড়ো করে, যাহা পৃথক করিয়া দেয় তাহাই এক করিয়া আনে, যাহা বাঁধে তাহাই মুক্তিদান করে, অসীমই সীমাকে সৃষ্টি করে এবং সীমাই অসীমকে প্রকাশ করিতে থাকে।

বস্তুতঃ এই দ্বন্দ্ব যেখানেই সম্পূর্ণরূপে একত্র হইয়া মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণতা।" ('পথের সঞ্চয়' প্রবন্ধ গ্রন্থের 'সীমা ও অসীম' প্রবন্ধ)।

'নিয়ম ও মুক্তি' প্রবন্ধে দেখি যে, সমগ্র হিতেই নিজের হিতবোধ মানুষের একটা ধর্ম। এই ধর্ম স্বার্থের বন্ধন কাটিয়ে পূর্ণপরিণত হয়ে উঠবার জন্যে মনুষ্য সমাজে আবির্ভূত হবার জন্য সতত চেষ্টা করে। আসলে কবির বাসনা- যে ধর্ম মনুষ্যত্বকে জাগায়, সেই ধর্মপথই আমাদের সর্বত্র সীমায় প্রতিহত চিত্তকে অসীমে মুক্তির দিকে টেনে নেয়। এই ধর্মবোধের জাগরণই আমাদের চিত্তকে সমস্ত কুসংস্কারের আবদ্ধতা থেকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে, আমাদের সমগ্র চেষ্টাকে চালিত করবে।

মনুষ্যত্বের উদ্বোধনই ধর্ম। এই মনুষ্যত্বের জাগরণেই চিত্তে জাগে শিবজ্ঞানে জীবসেবার আরতি। ধর্ম মানুষের আত্মশক্তির জাগরণ ঘটায়। এই আত্মশক্তির বলেই তার মনের বিভেদের কালিমা যায় মুছে, সদ চৈতন্যে চালিত হয়, আপন-পর ভেদ ভুলে সবাকে দেখে আপনার প্রানের ধন করে। রবীন্দ্রনাথ গেয়ে ওঠেন-

"হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু'বাহু বাড়ায়ে নমি নর দেবতারে
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তারে।"
("ভারততীর্থ" কবিতা)।

এইভাবে নরদেবতার বন্দনাগীতিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবের মহামিলন কামনা করেন। নরদেবতার পবিত্র প্রেমের বন্দনাতেই গৌতমবুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট ও চৈতন্য মহাপ্রভু মহামানবের মিলন সমবায় এনেছেন। শাশ্বত সনাতন ধর্মের মূল কথা হলো বিশ্বের সর্ব মানুষ আমার ভাই, আমার বোন, আমরা একই অমৃতের সন্তান। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর এই ভাবৈক্যে বিশ্বমানবকে এক মিলনসমবায়ে এনে পৌঁছে দিয়েছেন।

বিচ্ছেদ নয়, মিলনই ভারতাত্মার মূল ধর্ম। বিশ্বমানবতার পুরোহিত ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথেরও তাই মূল বক্তব্য, আচারসর্বস্ব বিভেদধর্মী জাতের ধর্ম নয়, জাতির ঐকরাষ্ট্রিক সত্তাকে উদ্বোধিত করেই মানবধর্মের যথার্থ ধর্মসমবায় গড়ে উঠবে। এইরূপ ঐকত্রিক ধর্মসমবায় জাগাবে আত্মশক্তি। আত্মশক্তির জাগরণে উদ্বোধিত হবে মনুষ্যত্ব। আর খাটি মনুষ্যত্বের প্রভাবেই ভারতবাসী বিশ্বগ্রাসী প্রেমের বন্ধনে গড়ে তুলতে পারবে মহামিলনের মিলনক্ষেত্র,-মহাধর্ম সমবায়ের মহান ঐকত্রিক ক্ষেত্র।

**রবীন্দ্র-সমবায় চিন্তনের মধুমিশ্রা: বিশ্বসমবায়:** কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের, দার্শনিক ঋষি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রেমের, স্বজাতি প্রেমের অসংখ্য ভাবনালোকের রবিচ্ছটার এক উজ্জ্বল হীরকদ্যুতি তাঁর সমবায় চিন্তা। শিক্ষাহীন, চেতনাহীন, ভরসাহীন, নিরন্ন বুভুক্ষু জাতির অন্তরে তিনি দিয়েছেন জ্ঞানের আলো, চেতনাহীন হৃদয়ে দিয়েছেন ভরসার তীব্র শক্তি, আর নিরন্ন জাতির আর্থিক ভরসার দিক নির্দেশ করে প্রাণে এনেছেন নির্মল আনন্দের ফল্গুধারা। আবার স্বদেশ প্রেমের চৈতন্য জাগিয়ে জাতিকে মিলিয়েছেন বিশ্বপ্রেমের মিলনমেলায়। আসলে স্বদেশের মধ্যস্থতায় বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। আমরা স্বদেশকে ভালবেসে তার পদমূলে যে ভক্তিপূত পূজা নিবেদন করি, তা গিয়ে পৌঁছায় বিশ্বদেবতারই, বিশ্বমায়েরই পদমূলে-

"ও আমার দেশের মাটি,

তোমার পরে ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বময়ীর- তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

দেশজননী ও বিশ্বজননী এক এবং অভিন্ন। কারণ, দেশজননীর বক্ষের ওপর বিশ্বজননীরও আঁচল পাতা। স্বদেশের কৃষিসমবায়ের উন্নতি চিন্তার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে কবির সেই বিশ্বমায়ের সঙ্গে মিলনের আদর্শ- "আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। আজ শুধু চাষীর লাঙলের ফলার সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নয়- সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে, বিদ্যার সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাহার সংযোগ হওয়া চাই।"

কবির মতে ভোগ-লিপ্সাই মানুষকে লোভী করে এবং লোভরিপুর প্রশ্রয়েই মানুষের ভোগের সীমা মনুষ্যত্বের সীমানা লঙ্ঘন করে। এই ভোগ-লোভের সংযমসীমা নির্ধারণ করে জ্ঞান। যথার্থ জ্ঞানসমবায় প্রতিষ্ঠা পেতে চাই শিক্ষা সমবায়ের কল্যাণদায়ী প্রভাব। জ্ঞান সমবায় জীবিকা সমবায়েরও ভাগ্য নিয়ন্তা। এই জীবিকা সমবায়ে অন্তর্ভুক্তি ঘটবে কৃষিসমবায়, অর্থসমবায় ও শিল্পসমবায়। কৃষি-অর্থ ও শিল্পসমবায়ের গুণগত উৎকর্ষবিধানে সাহায্য করবে বিজ্ঞান সমবায়। জ্ঞান সমবায় আর বিজ্ঞান সমবায়ের সুদূরপ্রসারী ফলস্বরূপ আসবে ধর্মসমবায়। আর এই ধর্মসমবায়ের হাত ধরেই ভারতবাসীর জীবনধর্মে আসবে মহামানবের সঙ্গে মহামিলন। কবি-কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়ে ওঠে - "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবেনা ফিরে । এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

এই হলো সামঞ্জস্য সন্ধানী ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের মুক্ত আর প্রাণ বাণী। ভারতীয় সভ্যতার মর্মবাণী। ঈশ্বর অমৃতময়, তিনিই সর্বভূতে বিরাজমান। ভারতবাসী চরমমনুষ্যত্বের দ্বারা, পরমত্যাগের দ্বারা, নিষ্কাম কর্মের দ্বারা নিজের জীবাত্মাকে সেই সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মার সঙ্গে মেলাতে চায়। "যশ্চাস্ময়স্মিন্নাকাশে তেজোময়েহমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভুঃ।" যে "তেজোময়েহমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভুঃ" হয়ে আছেন তিনিই ব্রহ্ম। বিশ্বজগতের সর্বত্র এই অনন্তস্বরূপের অনুভবে আছে। এই অনন্তস্বরূপ সর্বানুভু পরম ব্রহ্মের সঙ্গে মানবাত্মার যোগের সাধনাই ভারতবর্ষের সাধনা। এই পরম ব্রহ্মই সর্বানুভু বিশ্বব্রহ্মান্ড। সুতরাং তাঁর সঙ্গে মিলনের বোধই হল বিশ্ববোধ। "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"- নিষ্কাম কর্মে ত্যাগের যোগেই তাকে পাওয়া যায়।

নিষ্কাম কর্মে মানুষ ত্যাগী হয়। এই ত্যাগের দ্বারাই মানুষ নিজেকে সকলের সঙ্গে মেলাতে চায়। আর তখনই পরিবারবোধের চেয়ে সমাজবোধ, সমাজবোধের চেয়ে স্বদেশবোধ, আর স্বদেশবোধের চেয়ে বিশ্ববোধে সে উপনীত হয়। বৃহৎ ত্যাগের জন্য সে তখন হয় প্রস্তুত। এইভাবে নিজের ত্যাগের মহত্বের সাধনায় সে নিজের ঐক্যবোধের ক্ষেত্রকে ক্রমশ বড়ো করে তুলে সৎ-চিৎ-আনন্দের উপলব্ধিতে। পরমাত্মাকে বিশ্ববোধে নিজের মধ্যে লীন করে সার্থক হয়। উপনিষদ বলে-

"যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে।।"

অর্থাৎ, যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যেই দেখেন এবং পরমাত্মাকে দেখেন সর্বভূতের মধ্যে, তিনি তখন আর কাউকে ঘৃণা করেন না। "সর্বব্যাপী স ভগবান তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ।" তখন সর্বভূতে তিনি শিবজ্ঞানে জীবকেই দেখেন, জীবজ্ঞানে দেখেন শিবকেই। আর দেখেন সর্বগত মঙ্গলকে। এই চৈতন্যময়তার সাধনার দ্বারাই ভারতবাসী জিগীষা নয়, জিঘাংসা নয়, প্রভুত্ব নয়, নয় প্রবল প্রতিপত্তি; তখন বর্ণের সঙ্গে

বর্ণের, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের,- আপনার সঙ্গে পরের- বিভেদ-বিচ্ছেদ ভুলে মানুষ এক অখন্ড বিশ্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয় এবং বিশ্বের সর্বলোকের মধ্যে নিজেকেও একাত্মভূত করে মহামিলনের এক ঐক্যসমবায়ে মিলিত হয়। এখানেই নিষ্কাম কর্মের পুরোহিত, ঔপনিষদবেত্তা দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথের, বিশ্বপ্রেমিক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সমবায় চিন্তার বিশ্বজনীন প্রকাশ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

**তথ্যসূত্র:**


1) 'সমবায়নীতি: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সমবায় - ১, সমবায়।
2) 'অর্থনীতির পথে' ভবতোষ দত্ত, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৭।
3) ঐকতান: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী।
4) 'আকাশের চাঁদ': রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: সোনার তরী, রবীন্দ্ররচনাবলী-৩, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৫৭।
5) 'রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তা': সুব্রত গুপ্ত ও পরিমল চক্রবর্তী, মডার্ন কলাম, কলকাতা, ১৩৯৪।
6) রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়: ড. ক্ষুদিরাম দাস, মল্লিক ব্রাদার্স, কলেজস্ট্রীট, কলকাতা।
7) 'মুক্তি' (প্রবন্ধ) 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধ গ্রন্থ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
8) 'হলকর্ষণ' প্রবন্ধ, পল্লীপ্রকৃতি প্রবন্ধগ্রন্থ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মুক্তির পথ' প্রবন্ধ, 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধ গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
9) "মুক্তির পথ' প্রবন্ধ, 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধ গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।